e-paper

পৃথিবীর ডায়েরি

বছর ১৬, সংখ্যা: ৩ | প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক পত্রিকা | জুন ২০১৫

জানা অজানা

অক্টোপাসের দৃষ্টি রহস্য

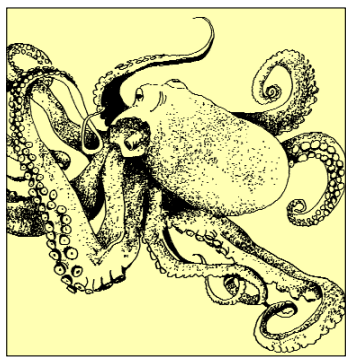

অক্টোপাস এমনই এক প্রাণী যারা কোনও রঙ দেখতে পায় না। সমুদ্রেরে গভীরে যে হাজারও রকমের রঙিন মাছ, প্রবাল, নানা ধরনের জলের উদ্ভিদ এক বর্ণময় জগৎ সৃষ্টি করে, অক্টোপাসরা তা সবই দেখে। কেবল তারা রঙের বাহার দেখতে পায় না। আর এই ব্যাপারে অক্টোপাসরা একা নয়, তাদের দূরের আত্মীয় স্কুইড-ও চোখে না কি ভাল দেখে না। তাদের বহু-শুঁড়ধারী বড় আত্মীয়দের মত তারাও না কি সমুদ্রের দুনিয়াটাকে সাদা-কালো চোখে দেখে।

এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। পৃথিবীর অনেক প্রাণীর চোখেই রঙ ধরা দেয় না। সাদা আর কালো ছাড়া আর কোনও রঙ দেখতে পায় না তারা। অক্টোপাস আর স্কুইডের ক্ষেত্রে কিন্তু এক বিস্ময়কর ব্যাপার লক্ষ করা গেছে। দেখা গেছে, যখনই শত্রুর হাত থেকে বাঁচা বা শিকার ধরার জন্য তাদের আত্মগোপন করার প্রয়োজন হয়, তখনই তারা বহুরূপীর মত রঙ বদলে ছদ্মবেশ ধারণ করে। অর্থাৎ, তাদের আসে পাশের মাটি, বালি, প্রবাল, পাথর বা গাছগাছালির রঙের সঙ্গে মিশে থাকার জন্য তারা তাদের নিজেদের শরীরের রঙ সেই অনুযায়ী বদলে ফেলে। ফলে কোনটা পাথরের চাঙ্গর আর কোনটা জলজ্যান্ত

এবার ২ পাতায়

হিমালয় হিমবাহহীন হতে চলেছে

মাত্র ১০০ বছরের মধ্যে প্রবল জলসঙ্কটে পড়বে হিমালয়ের ওপর নির্ভরশীল দেশগুলি

হিমালয় পর্বতমালা আছে বলেই ভারত, চিন, নেপাল, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও এশিয়ার আরও কিছু দেশের কোটি কোটি মানুষ বেঁচে আছে। কারণ, হিমালয় আছে বলেই জল আছে। হিমালয়কে পৃথিবীর ১নং জলের ট্যাঙ্ক বললে ভুল হবে না। ওই পর্বতমালায় উঁচু উঁচু শৃঙ্গে যে তুষার জমে থাকে, তা থেকেই এশিয়া মহাদেশের এক বিরাট এলাকায় জলের যোগান আসে। তা থেকে উপকৃত হয় সবাই – গাছপালা, পশুপাখি, হাজারও জলচর প্রাণী, আর মানুষও। পাহাড়ের গায়ে জমে থাকা হিমবাহের বিন্দু বিন্দু গলা জল ছোট ছোট ঝোরা সৃষ্টি করে। আবার অনেকগুলি ঝোরা একে অপরের সঙ্গে মিশে সৃষ্টি করে নদী । আর কয়েকটি নদী এক হয়ে গিয়ে এক বিরাট নদীর আকার ধারণ করে – সৃষ্টি হয় গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, মেঘনা, তিস্তা ব্রহ্মপুত্র, ইয়াঙ্গসের মত সভ্যতা লালনকারী প্রবাহ। শুধু তাই নয়, বরফে ঢাকা হিমালয়ের যে বাতাবরণ তা সমুদ্র থেকে ধেয়ে আসা মৌসুমী বায়ুর গতিবিধি অনেকটাই নির্ধারণ করে। আর সেই সুবাদে আসে ঘন মেঘ, দেশজুড়ে নামে বর্ষা, উৎপন্ন হয় খাদ্য। ফলে, হিমালয়ের হিমবাহ যদি কোনও দিন শুকিয়ে যায়, তা হলে অন্য সব প্রাণীর কী হবে তা বলা না গেলেও, কোটি কোটি মানুষের বেঁচে থাকাই যে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে তা বোধহয় বলাই যায়। আর চিন্তার ব্যাপার হল, হিমালয়ের পাহাড়ে পাহাড়ে যে হারে তুয়ারপাত হচ্ছে প্রতি বছর, তার চেয়ে ঢের দ্রুত হারে তা গলে যাচ্ছে। ফলে তুষারের ঘাটতি বাড়ছে। হিমবাহগুলি ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে – যার মানে দাঁড়াচ্ছে পৃথিবীর ১নং জলের ট্যাঙ্কে সঞ্চিত জলের পরিমান ক্রমেই কমছে। এ ভাবে চললে একদিন তো সে জল শেষ হয়েই যাবে। তখন কি হবে?

নেপাল, ফ্রান্স আর নেদারল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা যৌথ ভাবে গবেষণা করে জানিয়েছেন যে পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের ওপর জমে থাকা বরফ বেশ দ্রুত হারে গলে যাচ্ছে। এবং তাঁরা এও বলেছেন যে, আজ যে ভাবে গ্রিনহাউস গ্যাস পরিবেশে মিশছে তা যদি অব্যাহত থাকে, তা হলে ২১০০ সালের মধ্যে – অর্থাৎ আজ থেকে মাত্র ৮৫ বছর পরে – এভারেস্ট'র ৭০-৯৯ শতাংশ হিমবাহ গলে যাবে। গবেষক জোসেফ শি বলেছেন, "আগামী দিনে যা ঘটতে চলেছে তা খুব পরিষ্কার। পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হিমবাহগুলি আরও তাড়াতাড়ি গলতে থাকবে।"

> **ভারতের ১৬.২% জায়গা জুড়ে আছে হিমলয়; সেখানে ৬১.৫% মানুষ কৃষি নির্ভর; ২০.৫% নানা চাকরি করেন; ২০২১-২০৫০ এর মধ্যে তাপ মাত্রা ১.৫-২.৫ সেলসিয়াস বাড়তে পারে**
>
> - ডাউন টু আর্থ

শি বলেছেন, তাঁদের গবেষণা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বায়ুমন্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস-এর পরিমান, এবং তা বৃষ্টি আর তুষারপাতকে কতখানি প্রভাবিত করছে, তার ওপর নির্ভর করছে হিমবাহগুলির পরিণতি। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তাঁরা আরও একটা সম্ভাবনার কথা বলছেন, যা পর্বতমালায় ঘটিয়ে দিতে পারে আরও ওলটপালট। তাঁদের গবেষণার তথ্য দেখিয়ে দিচ্ছে যে উষ্ণতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উঁচু পাহাড়ে আজ যেখানে শুধুই বরফ পড়ে, সেখানে বৃষ্টিপাত শুরু হবে, আর তার ফলে জমে থাকা তুষার আরও বেশি মাত্রায় গলতে থাকবে। এর পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর। প্রথম দিকে বেশি পরিমান

এবার ৩ পাতায়

চামড়ায় চোখ

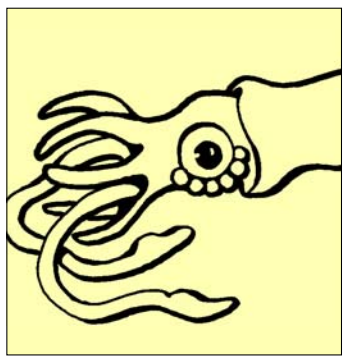

স্কুইড

১ পাতা থেকে

অক্টোপাস বা স্কুইড, তা বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় শত্রু বা শিকার উভয়ের কাছেই।

আর বিস্ময়ের কারণটা এখানেই। তারা তো রঙ দেখতে পায়না। অথচ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে রঙ মেলাতে তারা নিজেদের শরীরের রঙ বদলে ফেলে কী করে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড আর ক্যালির্ফনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা থেকে জানা গেছে যে অক্টোপাস আর স্কুইড উভয়ই চোখ ছাড়াও তারা তাদের চামড়া দিয়েও দেখে। তাদের চামড়ার মধ্যে আছে এমন সব কোষ যেগুলি চারপাশ থেকে আসা আলোর রঙ বিশ্লেষণ করে বুঝে যায় যে তাদের কাছের বস্তুগুলির রঙ কেমন। ফলে অক্টোপাসের শুঁড়ের একটা অংশ যদি শ্যাওলা-ঢাকা পাথরের ওপর থাকে, তা হলে সেটি হয়ে ওঠে কালচে-সবুজ, আর যেখানটা থাকে বালির ওপর সেখানটা বালি থেকে ঠিকরে আসা আলো অনুযায়ী ফুটিয়ে তোলে সেই রঙ। **সূত্রঃ লাইভ সায়েন্স**

বরফ-গলা জল

মেরু প্রদেশে বরফ গলছে দ্রুত হারে, আর বাড়ছে সমুদ্রের জলতল। ফলে বহু দ্বীপ ও দ্বীপরাষ্ট্র অদূর ভবিষ্যতেই তলিয়ে যাবে জলের তলায়। সুন্দরবনে সমুদ্রের জল যে হারে বাড়ছে তাতে বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা ১৫-২৫ বছরের মধ্যে বঙ্গোপসাগরেই ২০০ দ্বীপ ডুবে যাবে। আর এটা ঘটলে ভারতে ৫০ লক্ষ এবং বাংলাদেশে ৮০ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হবেন। আর সেই সঙ্কটের মোকাবিলা করা দু'দেশের পক্ষেই কঠিন হবে। **সূত্রঃ পরিষেবা**

বাজপাখির জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসালয়

যাকে অজ্ঞান করিয়ে এন্ডোস্কোপি চলছে, যার গলার মধ্যে একটি নল ঢুকিয়ে ডাক্তার পরীক্ষা করছেন, আর পেছনে ভেসে উঠছে মনিটরে সেই ছবি, সে দু'পেয়ে হলেও মানুষ নয়। ডানাওয়ালা একটি বাজ পাখি। আর ঘটনাটি ঘটছে কাতারের রাজধানী দোহা'য় একটি হাসপাতালে। এবং বিবিসি'র এক প্রতিনিধি জাস্টিন মারোজি তার সাক্ষী থাকছেন। আসলে আরব উপসাগরীয় অঞ্চলে বাজ পাখি সঙ্গে নিয়ে শিকার একটি জনপ্রিয় খেলা। অনেকেই সেখানে বাজ পোষেন। সেই খেলায় আহতও হয় পাখিরা। আর সেই আহত পাখিদের চিকিৎসার জন্যই দোহায় গড়ে উঠেছে এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসালয়।

প্রাণের পাখি

দোহার এই বাজ পাখিদের হাসপাতালটি বেশ অভিনব। সেখানে ৩০ জন পশুচিকিৎসক ও কর্মী আছেন যারা পাকিস্তান, ইরাক'র মতো মুসলমান দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে এসেছেন। রাজা বাদশাদের প্রাচীন এই খেলাটি সম্পর্কে এখনও বেশ আবেগপ্রবণ আরব দুনিয়ার খুবই ধনী দেশগুলির মানুষ জন। ফলে তাদের এই পোষ্যর জন্য খরচ করতে তাদের কোনও কার্পন্য নেই। বাজের ডানা ভেঙে গেছে, অপারেশনে তা জোড়া লাগানোর ব্যবস্থা আছে। বাজের খাবার হজম হচ্ছে না, ওষুধ দিয়ে সারাও। রক্ত পরীক্ষা বা অন্যান্য যা যা টেস্টের প্রয়োজন বা পর্যবেক্ষণের দরকার, সব ব্যবস্থা আছে এই হাসপাতালে। প্রচুর ভর্তুকি দিয়ে চালানো হয় হাসপাতালটি। তাও খুদে প্রাণী হলে কী হবে, তার চেক আপের জন্যও নয় নয় করে লেগে যাবে ২০ পাউন্ড, টাকায় প্রায় ২০০০। একটা এক্স-রে'র জন্য প্রায় ৪০০ টাকা লাগতে পারে। সে যাইহোক, আহত - অসুস্থ পাখির চিকিৎসা তো হচ্ছে। সৌদি আরব, কুয়েত এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের প্রায় সব দেশ থেকেই বাজ পাখিরা আসে এখানে চিকিৎসার জন্য। **সূত্রঃ বিবিসি**

মানুষখেকো মানুষ থাকত যে গুহায়

প্রায় ১৪,৭০০ বছর আগে কিছু মানুষ বাস করতেন এই 'গাউস গুহা'য়। ইংলন্ডের ওয়েলস'থেকে ১৪ কিমি উত্তর পশ্চিমে মেনডিপ পাহাড়ে চেদ্দার গ্রামের প্রান্তে খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল ওই গুহার। সময়টা ১৮৯২ থেকে ১৮৯৮, চেদ্দার'এরই বাসিন্দা রিচার্ড কক্স গাউ খুঁজে পেয়েছিলেন ওই গুহা। তাঁর নামেই গুহার নামকরণ।

পৃথিবীর নানা দেশেই বিভিন্ন সময়ে প্রাগৈতিহাসিক অনেক গুহা আবিস্কৃত হয়েছে। আর সেই সব গুহার দেওয়াল চিত্র, কখনও সেখান থেকে প্রাপ্ত নানা উপাদান (মানুষের মাথার খুলি, যেমন **ছবিতে**) থেকে সেই আদিম জীবনের প্রচুর তথ্যও পাওয়া গেছে। যেমন ভারতের মধ্যপ্রদেশে প্রাগৈতিহাসিক গুহা ভীমবেটকা। যার দেওয়ালে রয়েছে প্রস্তরযুগের মানুষের আঁকা গুহাচিত্র। স্পেনের আলতামিরা, ফ্রান্সের লাসেক্স। তেমনই গাউস কেভও প্রাগৈতিহাসিক।

এই গুহায় খনন কার্য চালিয়ে মানুষ এবং জীবজন্তুর কঙ্কাল মেলে। সেই সব কঙ্কালের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে জানা গেছে যে তখনকার মানুষ ছিল মানুষখেকো। সেখানে পাওয়া মানুষের কঙ্কালটিকেই ব্রিটেনের প্রাচীনতম মানবদেহের একটি পূর্ণাঙ্গ কঙ্কাল মনে করা হয় যার নাম দেওয়া হয়েছে 'চেদ্দার ম্যান'।

এই গুহা থেকেই বেরিয়ে এসেছে চেদ্দার ইয়ো নদী আর ১৮ ঝরণা। ভূ-বিজ্ঞনীদের মতে প্রায় এক লক্ষ বছর আগে শেষ তুষার যুগের সময় তৈরি হয়েছিল ওই গুহা। প্রায় ৩০০ ফিট গভীর এই গুহাটি ২.১৩৫ কিলোমিটার লম্বা। গুহার মধ্যে চুনা পাথরের অসংখ্য স্তম্ভ আছে। এই গুহা এখন অসঙ্খ 'হর্স শু' বাদুড়ের বাসস্থান। কক্স গাউ শুধু আবিষ্কর্তাই নন, এই গুহা সংস্কার করে তিনিই প্রথম গুহাটিকে পর্যটকদের সামনে তুলে ধরেন। তাঁর ছেলে উইলিয়ম প্রস্তর যুগের বেশ কয়েকটি নরকঙ্কাল খুঁড়ে বার করেন এই গুহা থেকে। **কৌশিক রায়, সূত্রঃ দ্য ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান, উইকিপেডিয়া**

আরকটিক ফক্স

নামেই বোঝা যাচ্ছে যে তার বাস মেরু অঞ্চলে। স্নো ফক্সও বলা হয়। ঘন লোমে ঢাকা ছোট্ট সাদা এই শেয়াল উত্তর মেরুর কানাডা, আলাস্কা এবং উত্তর এশিয়া ও ইউরোপের কনকনে ঠান্ডা জায়গায় থাকে। তার ঘন লোমই তাকে বাঁচিয়ে রাখে - ৪০/-৫০ ডিগ্রিতেও। কঠিন শীত চলে গেলেই অবশ্য তাদের লোমের রঙ বাদামি হয়ে যায়। ভূতল থেকে অনেক গভীরে গর্ত করে থাকা এই স্নো ফক্সরা তুষার খরগোস, ইঁদুর, পোকামাকড় এমনকী নাগালে পেলে সীলের ছানাও খায়। অবশ্য তাকেও শিকার হতে হয় মেরু ভালুক, নেকড়ে, তুষার পেঁচা আর মানুষের হাতে। ঘন্টায় তারা ৪৫ কিমি বেগে দৌড়তে পারে। গড়ে ৫/৭ বাচ্চা দেয়। একাকী থাকা এই তুষার শেয়ালদের পরমায়ু ৭-১০ বছর।

হিমবাহ

১ পাতা থেকে

বরফ-গলা জল গিয়ে পড়বে নদীতে, তার সঙ্গে যোগ হবে বৃষ্টি, যার ফল হবে ঘন ঘন বন্যা। তারপর একদিন পাহাড়ের তুষার ভান্ডার নিঃশেষ হয়ে গেলে দিকে দিকে সৃষ্টি হবে তীব্র জলসঙ্কট। কৃষিকাজে দেখা দেবে জলাভাব। ফলে কমে যাবে খাদ্যের উৎপাদন। জলবিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি পড়ে থাকবে অকেজো হয়ে। বিদ্যুতের ঘাটতির ফলে থমকে যাবে কলকারখানা। কর্মহীন হবে মানুষ। জলাভাবের পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই হয়ে উঠবে দুষ্কর।

সূত্র: *Glacier changes at the top of the world*, European Geosciences Union Press Release, 17.05.15

গানবাজনা মনোযোগ বাড়ায় ছাত্রছাত্রীদের

যেসব ছেলেমেয়েরা গানবাজনা শেখে, তারা কেবল সাংস্কৃতিক গুণ অর্জন করে না, সঙ্গে তারা পায় আরও কিছু – মনের একাগ্রতা। গবেষণায় জানা যাচ্ছে ছোটবেলা থেকে সঙ্গীত চর্চা করলে – তা সে যন্ত্রসঙ্গী বা কণ্ঠসঙ্গীত যাই হোক না কেন – মস্তিষ্কের ওপর তার ভাল প্রভাব পড়ে। ভারমন্ট ইউনিভারসিটির কলেজ অফ মেডিসিন-এর এক গবেষণা বলছে যে, যারা সঙ্গীত শিক্ষা নেয় তাদের মনযোগ করার ক্ষমতা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নিজেদের আবেগ তারা সাধারণের চেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণে রাখে, আর

দুশ্চিন্তার শিকার হয় না সহজে।

প্রধান গবেষক মনোবিজ্ঞানী জেমস হুডজিয়াক বলেছেন, ছোটরা বড় হয়ে ওঠার সময় তাদের মস্তিষ্কের গঠন প্রভাবিত করে তাদের বাবা, মা, ভাই-বোন, দাদু-ঠাকুমা-দিদিমা, তাদের শিক্ষক এমনকী অবলা পোষ্য ও এবং পড়াশোনার বাইরের জগৎ । আর তার ওপর অনেকটাই নির্ভর করে তাদের আচরণ। এর সঙ্গে হুডজিয়াক যোগ করেছেন যন্ত্রসঙ্গীতের অবদান।

পরীক্ষায় দেখা গেছে বাদ্যযন্ত্র শেখার মধ্যে দিয়ে মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ জায়গা যেগুলি আমাদের নানা আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলির গঠন মজবুত হয়। কারণ সঙ্গীত চর্চার মধ্যে দিয়ে মস্তিষ্কের বিভিন্ন বিভাগে অনেক ধরনের ক্রিয়াকলাপ চলতে থাকে যা তাদের কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়, আর সেই সঙ্গে তাদের নিয়ন্ত্রণশক্তি। ফলে হুডজিয়াক বলছেন ছোট বয়স থেকেই মনের একাগ্রতা বাড়ে, বৃদ্ধি পায় নিজের আবেগকে বশে রাখার ক্ষমতা, আর দুশ্চিন্তাকে দূরে রাখার মানশিক শক্তি।

সূত্রঃ সায়েন্স ডেইলি

পৃথিবীর উষ্ণতম মহাসাগর ভারত মহাসাগর

জেনে রাখা ভাল

পৃথিবীর মোট আয়তনের ২০% জুড়ে রয়েছে ভারত মহাসাগর বা ইন্ডিয়ান ওসান। এবং তৃতীয় বৃহত্তম নোনা জলের আধার এই মহাসাগরের নামকরণ হয় ভারতের নামেই। ভারত মহাসাগরের উত্তরে রয়েছে ভারত সহ দক্ষিণ এশিয়া, পশ্চিমে রয়েছে আফ্রিকা আর পুবে ইন্দোচিন, সুন্ডা দ্বীপপুঞ্জ, অস্ট্রেলিয়া এবং তার একদম দক্ষিণে অ্যান্টার্কটিকা। এছাড়াও মাদাগাস্কার, শ্রীলঙ্কা, মলদ্বীপ, মরিশাস'র মতো দ্বীপরাষ্ট্র ছড়িয়ে আছে তার বুকে। তার সম্পর্কে আরও জানা যায় -

● এই মহাসাগরই পৃথিবীর উষ্ণতম মহাসাগর।

ভারত মহাসাগরের গড় গভীরতা ১২,৭৬০ ফিট। তার তটভূমি অত্যন্ত খনিজ

সমৃদ্ধ। এবং তার তীরবর্তী দেশগুলি সেই সম্পদ যথেচ্ছ শোষণ করে।

● এই সাগরের মধ্যে দিয়ে পারস্য উপসাগর ও থাইল্যান্ড'র তৈলক্ষেত্রগুলি থেকে বিপুল পরিমানে পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোপন্য নিয়ে যান চলাচল করে।

● ভারত মহাসাগর বছরে দু'বার শীতে ও গ্রীষ্মে তার গতি বদলায়।

● এই মহাসাগরে তেলের ভাঁড়ারটিও বেশ সমৃদ্ধ। পৃথিবীর উৎপাদিত তেলের প্রায় চল্লিশ শতাংশই ভারত মহাসাগর থেকে পাওয়া যায়।

ভারত মহাসাগর নাকি প্রতি বছরই ২০ সেন্টিমিটার করে চওড়া হচ্ছে।

● জলের উষ্ণতা বেশি হওয়ায় এখানে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের উৎপাদন কম হয় যা জলজ প্রাণীর খাদ্য। তাই ভারত মহাসাগরে মাছ সহ জলজ প্রাণী কম।

সূত্রঃমেরিনইনসাইট.কম, লাইফস্টাইল.আইলাভইন্ডিয়া.

বিপন্ন পরিবেশ, স্থলে-জলে উদ্বাস্তু হচ্ছে প্রাণীরা

শুধু মানুষ নয়, পরিবেশের কারণে উদ্বাস্তু হচ্ছে বন্য প্রাণী, জলজ প্রাণীরাও। খরা, বন্যা, বিধ্বংসী ঝড় বা ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষকে যেমন ঘর বাড়ি ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়। তেমনি দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেও আবাসস্থল ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালাতে হচ্ছে প্রাণীদেরও। আর এই পালাতে পালাতে মানুষের মতোই কত প্রাণীর যে মৃত্যু ঘটছে তার সীমা সংখ্যা জানাই দুষ্কর। ঠিক যেমন ঘটেছে সম্প্রতি নিউজিল্যান্ড ও ক্যালিফর্নিয়ায় পাইলট হোয়েল ও সি লায়ন'র ক্ষেত্রে।

কোনও কোনও বিপর্যয়ের পূর্বাভাসে মানুষ তবু সতর্ক হওয়ার, প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ পায়, কিন্তু প্রাণীদের ক্ষেত্রে প্রায়শই তেমনটা ঘটে না। ঘটে না বলেই নিউজিল্যান্ডের দক্ষিণ দ্বীপের সমুদ্র তীরের কাছে অগভীর জলে সম্প্রতি শ'দুয়েক 'পাইলট তিমি'এসে আটকে গেছে। প্রায় দু'ডজন তিমিকে মৃত দেখা গেছে।

আর ২০১৩ থেকে সি লায়ন'র বাচ্চারা দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ার সমুদ্র তীরে ভেসে আসছে। না খেতে পাওয়া রুগ্ন ছোট্ট ছোট্ট সেই সব ছানারা মারাও যাচ্ছে। উদ্ধারকারীরা সমুদ্র তীরের রিসোর্টের আনাচ কানাচ থেকে,

কখনও গাড়ির নীচ থেকে তাদের উদ্ধার করছেন। শুধু এবছরই এখন পর্যন্ত ৫০০ সি লায়নের বাচ্চা উদ্ধার করে রাজ্যের পুনর্বাসন কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে।

গত দু'বছরের তুলনায় এবার তাদের সংখ্যা অনেক বেশি। ঢেউয়ের মতোই তারা যেন আছড়ে পড়ছে। এমনিতে সমুদ্রের স্বাস্থ্য ভাল না খারাপ-তার ইন্ডিকেটর হিসেবে ক্যালিফর্নিয়ার এই সি লায়নদের গণ্য করা হয়।

সাধারণত সি লায়নরা যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে বা তাদের মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা দেখা যায়, তাহলে ধরেই নেওয়া হয় সমুদ্রে কোনও অঘটন কিছু ঘটেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কী ঘটেছে সেটা বিজ্ঞানীরা এখনও অবধি বুঝে উঠতে পারছেন না।

পুনর্বাসন কেন্দ্র এখন বেবি সি লায়নদের ভিড়ে উপচে পড়ছে। তাদের কারও কারও ওজন এই বয়সে যা থাকার কথা তার অর্ধেকেরও কম। বস্তুত যখন তাদের মায়ের দুধ খাওয়ার বয়স, তখন কেন নিজেদের বসতি ছেড়ে অজানা বিপদ সঙ্কুল পথে তাদের পাড়ি দিতে হচ্ছে তা কারও বোধগম্যই হচ্ছে না। সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে ওই ভেসে আসা অসহায় সি লায়নদের ৫০ শতাংশই মারা যাচ্ছে।

এই বিপর্যয়ের কারণ বোঝা যাচ্ছে না। বিজ্ঞানীরা অবশ্য লক্ষ করছেন গত এক বছরে তীরের কাছাকাছি সমুদ্রের জল বেশ গরম থাকছে। যার প্রভাব হয়তো ইকো সিস্টেমে পড়ছে। আর এই বছর তো অস্বাভাবিক গরম পড়েছে। যার দরুন সমুদ্রের স্বাভাবিক খাদ্য ব্যবস্থা কিছুটা ওলোট পালট হচ্ছে। মাছ, কাঁকড়া, কচ্ছপরাও ইতি উতি সরে পড়ছে। ফলে মরছে পাখিরাও। কিন্তু সমুদ্রের এই গরম জলের প্রভাবেই সি লায়ন ছানাদের জীবন এতো টা বিপন্ন হয়ে পড়ছে কি না তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

সূত্রঃ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

রাত জাগা বাড়ছে, দিনে তাই ঘুম ঘুম ভাব

আমরা রাত-জাগা পাখি নই। প্রকৃতি রাত-জাগা পাখিদের এমন ভাবে তৈরি করেছে যাতে তারা রাতে জাগে আর দিনে ঘুময়। কিন্তু মানুষকে প্রকৃতি তৈরি করেছে ঠিক উল্টো করে। আমাদের দিনে জাগা আর রাতে ঘুমনোর কথা। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম ভেঙে আমরা আমাদের জেগে থাকার ঘন্টাগুলো বাড়িয়েই চলেছি। দিন ফুরলেও অনেক রকম কাজ আমাদের বাকি থেকে যায়। টিভি দেখা, ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর বিপুল তথ্য জগত হাতড়ানো, অবিরাম চেনা অচেনা বন্ধুর সঙ্গে 'চ্যাট' করা বা কথা বলে যাওয়া ইত্যাদি আরও কত কী! আর ঘুমকে বঞ্চিত করেই আমরা এই জেগে থাকার সময়টা বার করে নিচ্ছি।

এতে আমাদের মন ভাল হলেও, শরীর কিন্তু সায় দিতে চায় না। বলা হচ্ছে সারাদিনের ধকল সহ্য-করা শরীরের মেরামতির জন্য সাত ঘন্টা ঘুম একান্তই জরুরি। ফলে যথেষ্ঠ

ঘুম না হলে শরীরে নানা গোলযোগ দেখা দিতে পারে। যার মধ্যে মোটা হয়ে যাওয়ার প্রবনতা হল একটা। তবে সুস্থ থাকতে শরীরের কথা কে ভাবে! কিন্তু ঘুমের ঘাটতি যে কেবল মানুষের শরীরকেই নিঃশব্দে কাহিল করছে তাই নয়, সমাজ বা বিশেষ করে অর্থনীতির ওপরও তার প্রভাব পড়ছে। ঘুমের অভাবে পরের দিন শরীর পুরোপুরি চাঙ্গা হয়ে ওঠে না। হাত পা মাথা সবই কেমন চলে কিঞ্চিৎ শ্লথ গতিতে। আর কাজও হয় সেই তালে। ফলে ঘুমের ঘাটতির জন্য দেখা দিচ্ছে কাজের ঘাটতি। দেশের পক্ষে যা মোটেই ভাল নয়।

সূত্রঃ ডাউন টু আর্থ

গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে যাচ্ছে কেন মানুষ

গ্রামের মানুষ আর গ্রামে থাকতে চাইছেন না। গ্রামছাড়া ওই রাঙামাটির পথ ধরে তাঁরা চলেছেন শহরের দিকে। সেখানে গিয়ে তাঁরা গড়ছেন তাঁদের নতুন আস্তানা। তিন বছর আগে, ২০১২ সালে, ভারতের শহরে বাস করতেন ২৯ কোটি মানুষ। সেদিন থেকে সংখ্যাটা দিন দিন বেড়েছে। মনে করা হচ্ছে ২০৩০ সালে, মানে আজ থেকে ১৫ বছর পরে, সেই সংখ্যাটা গিয়ে হবে ৫৯ কোটি। কিন্তু শহর তাদের ভালভাবে বাঁচার আশ্রয় দিতে পারবে তো?

কেন এত মানুষ এখন শহরমুখী হচ্ছেন? কারণ, গ্রামের তুলনায় শহরে সুখ সুবিধে বেশি। মনে করা হয় শহরে এলে রোজগারের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। অনেক রকম কাজ সেখানে। কোনওক্রমে একটা থাকার ব্যবস্থা করে ফেলতে পারলে – তা সে পায়রার কুটুরির মত ছোট হলেও ক্ষতি নেই – অনেক পরিষেবা হাতের কাছে চলে আসবে। মিলবে বিদ্যুতের আলো, পাখার হাওয়া, পরিশুদ্ধ জল, টিভির পর্দার বিনোদন। একটু বেশি উপার্জন করে সচ্ছলতা বাড়লে ঘরে আসতে পারে ফ্রিজ, এমনকী এসি মেশিনও। চাঁদি-ফাটা গরমেও মিলতে পারে ঠান্ডা পানীয় আর শীতল বাতাসের আরাম।

তাছাড়া হাতের কাছে পাওয়া যেতে পারে চিকিৎসার সুবিধে। ডাক্তারবাবুরা আছেন। আছে হাসপাতাল, যদিও শোনা যায় সেখানে না কি ফোড়েদের প্রবল দাপট। কিন্তু গ্রামে সে সুবিধে নেই। প্রাথমিক চিকিৎসালয় থাকলেও তা বেশ দূরে দূরে। রাতে হঠাৎ কেউ অসুস্থ হলে, রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াটাই কঠীন হয়ে পড়ে। গাড়ি মেলে না সহজে, অ্যাম্বুলেন্স তো থাকে না বললেই চলে। জানা যাচ্ছে যে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থাটা আফ্রিকার সেই অনুন্নত সাহারা সংলগ্ন অঞ্চলের মতোই। কারণ, গ্রামের দিকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এখনও বেশ দুর্বল। সে দিকে তেমন নজর দেয়নি কেউ। অথচ ভারতের বেশির ভাগ মানুষ এখনও গ্রামেই থাকেন। কিন্তু হাজারও প্রতিকুলতার মধ্যে তাঁরা আর থাকতে চাইছেন না।

আর মাত্র ২০ বছরের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যার ৬০ শতাংশই হবে তরুণ-তরুণী। তাদের একটা বড় অংশ হবে গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা। কাজের সন্ধান করবে ওই বিরাট টগবগে তরুণদল। কিন্তু গ্রামে তারা কাজ পাবে কি? এখনই শোনা যাচ্ছে গ্রামে কাজের সুযোগ কমে যাচ্ছে। ফলে আগামী দিনে তো গ্রামের যুবক যুবতীরা আরও বেশি সংখ্যায় শহরে চলে আসবেন জীবিকার সন্ধানে। শহরগুলি হয়ে উঠবে আরও জনবহুল।

প্রশ্ন হল আমাদের শহরগুলি কি ওই বাড়তে থাকা জনসংখ্যার চাপ সইতে পারবে? অত মানুষের থাকার জায়গা, তাদের প্রয়োজনীয় জল, চিকিৎসার ব্যবস্থার চাহিদা মেটানর জন্য আমদের শহরগুলি কি প্রস্তুত হচ্ছে?

সূত্রঃ ডাউন টু আর্থ

সমুদ্রের জল এক মিটার বাড়লে শুধু ভারতেই ৭১ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হবে

ডাউন টু আর্থ

RNI Regn No. WBBEN/2000/1531 Date of Publication: June 1, 2015 Postal Regn No.KOL RMS/262/2013-15

অবাক পৃথিবী

● আমরা যদি বিষুব রেখার ওপর বা পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও ঘোরার গতি বেগ হবে ঘন্টায় ১০০০ মাইল। আর যদি কোনও পোল বা মেরুতে দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে ঠিক একই জায়গাতে আমরা দাঁড়িয়ে থাকব। অর্থাৎ গতিবেগ হবে প্রায় শূন্য।

● ব্রিটিশ মিউজিয়ামে যত জিনিস আছে তার মাত্র ১% প্রদর্শিত হয়।

● বুলগেরিয়া ইউরোপের প্রাচীনতম দেশ। এবং ৬৮১ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই দেশটির নামের কোনও পরিবর্তন হয় নি।

● গ্রিসের মোট জন সংখ্যার ৪০%ই তার রাজধানী অ্যাথেন্স'এ বাস করে।

● রাশিয়াতে ১৩,০০০ এরও বেশি গ্রাম আছে যেখানে একজন মানুষও বাস করে না।

● গ্রিনল্যান্ডই পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ।

খাবার ধুয়ে খায় রুকুন

সাধারণত মানুষই খাবার খাওয়ার আগে সেগুলি ধুয়ে খায়। অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে এমন অভ্যাস সচরাচর দেখা যায় না। তবে বিচিত্র এই জীব জগতে এমন কেউ কেউ থাকে যাদের কিছু কিছু আচরণ অনেকটা মানুষের মতো। যেমন রাকুন'দের কথাই ধরা যাক। অনেকের মতে এই রাকুনরা খাবার আগে তাদের খাওয়ার না কি জলে ধুয়ে নিয়ে খায়।

দেখা গেছে অনেক রাকুনই এমন আচরণ করে। এমনকী খাবারের কাছাকাছি ধোয়ার মত কোনও জল না পেলে তারা সেই খাবার খেতে অস্বীকার করে। আবার এও দেখা গেছে যে জলের দেখা পেলে খাওয়ার ব্যাপারে তারা বেশ উৎসাহী হয়ে ওঠে। তবে সব রাকুনই যে এমনটা করে তা নয়। অনেকে না ধুয়েই খাবার খায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমনও লক্ষ করা গেছে যে প্রয়োজন না থাকলেও রাকুনরা খাদ্যটি খাওয়ার আগে একবার জলে ডুবিয়ে নেবেই।

লোমে ঢাকা স্তন্যপায়ী এই প্রাণীটি ২৪-৩৮ ইঞ্চি লম্বা হয়। দক্ষিণ কানাডা থেকে পানামা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বসবাস তাদের। ধূসর রঙের গায়ে মাঝে মাঝে হলুদ বা বাদামির ছোপ থাকে। বেশ ঝাঁকড়া লোমশ লেজ বিশিষ্ট রাকুনদের চোখদুটির চারপাশ ঘন কালো রঙ। সাধারণত জলা জঙ্গলে থাকতেই পছন্দ করে। মাছ ব্যাঙ ছাড়াও চেরি, বাদামের মত ফল পাকুড়ও তাদের পছন্দ।

সাধারণত রাতের বেলাতেই তাদের যত কাজ কর্ম। মূলত একা একাই ঘুরে বেড়ায়। তবে বাচ্চা হলে তখন তারা কিছু দিন মায়ের সঙ্গে ঘোরে। গাছে চড়তেও ওস্তাদ আবার সাঁতারেও খুব পটু। বন্য পরিবেশে তারা মোটে ৩-৫ বছর বাঁচে। তবে তাদের লোম আর চামড়ার জন্য চোরা শিকারিদের হাতে তারা প্রায়ই মারা পড়ে।

ডঃ সমীরকুমার ঘোষ

পৃথিবীর ডায়েরি

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩০ টাকা (ডাক মাশুল সহ)

স্কুল, কলেজ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যে কোনও অন্য সংস্থা অথবা ব্যক্তিবিশেষ এই পত্রিকার গ্রাহক হতে পারেন। মানি-অর্ডার বা চেক দ্বারা টাকা পাঠান। চেক লিখবেন Prithibir Diary নামে।

যোগাযোগের ঠিকানা:
প্রকাশক
পৃথিবীর ডায়েরি
সি-এল ২৫৫, সেক্টর-২, সল্ট লেক, কোলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪/৯৪৩৩০৪৬৬৯৫

পাতিরাম

(কলেজস্ট্রিট–হ্যারিসন রোড ক্রসিং)
পৃথিবীর ডায়েরি পাওয়া যায়

ক্যুইজ?!?!

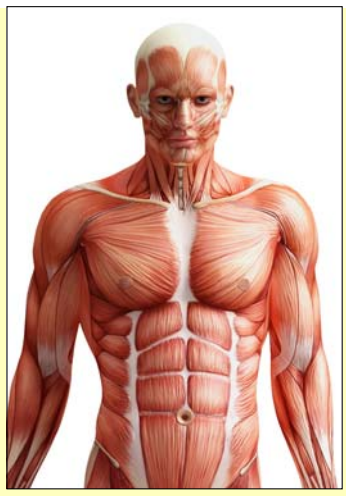

১। আমাদের শরীরে পুরোটা ঘুরতে রক্তের মোটামুটি কয় মিনিট সময় লাগে?
(ক) ১ (খ) ৫ (গ) ১১ (ঘ) ১৫

২। কোনটা ঠিক? ওজন অনুযায়ী মহিলাদের মগজ থেকে পুরুষের মগজ গড়পড়তা
(ক) ১০% ছোট (খ) একই
(গ) ১০% বড় (ঘ) কোনও ঠিক নেই

৩। এদের মধ্যে কোনটির গন্ধ মশাকে দূরে রাখে?
(ক) কলা (খ) সিট্রোনেলা বা লেমন গ্রাস (গ) রসুন (ঘ) লঙ্কা

৪। বর্তমান ভারতের কোথায় গত শতাব্দীতে রুপিয়ার জায়গায় এসকুডোস ব্যবহার হত?
(ক) পন্ডিচেরি বা পুদুচেরি (খ) কাশ্মীর (গ) গোয়া (ঘ) সিকিম

৫। জলহস্তির ইংরেজি নাম হিপোপটেমাস যার মানে কিন্তু নদীর ঘোড়া। নামটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
(ক) সহিলি (খ) বান্টু (গ) গ্রিক (ঘ) সুমেরিয়া

৬। মানুষের চামড়া এবং চুলের রং কিসের ওপর নির্ভর করে?
(ক) কেরাটিন (খ) ইনসুলিন (গ) মেলানিন (ঘ) ভিটামিন ডি

৭। আমাদের শরীরে ২০৬ টি হাড়। একটি পূর্ণবয়স্ক হাঙরের কতগুলি?
(ক) ৭৬ (খ) ৪ (গ) ২২ (ঘ) একটিও না

৮। কোন গ্রহ এতোই হাল্কা যে জলে ভাসতে পারে?
(ক) বৃহস্পতি বা জুপিটার (খ) বুধ বা ভেনাস (গ) শনি বা সেটার্ন (ঘ) তথ্যটি ভুল

৯। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব অনুযায়ী রোজ কত লোক ম্যালেরিয়াতে মারা যায়?
(ক) ৬০০ (খ) ১৬০০ (গ০ ২৬০০ (ঘ) ৬০

১০। কে সব থেকে বেশি ম্যাচে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হয়েছেন?
(ক) ঝুলন গাঙ্গুলি (খ) ডায়না এডুলজি (গ) শুভাঙ্গী কুলকার্নি (ঘ) মিতালি রাজ

উত্তর: ১/ক; ২/গ; ৩/খ; ৪/গ; ৫/গ; ৬/গ; ৭/ঘ; ৮/গ; ৯/খ; ১০/ঘ

একটি গাছ, অনেক প্রাণ

স্বত্বাধিকারি মালবী গুপ্তর পক্ষে অনীশ গুপ্ত দ্বারা ইন্সট্যান্ট প্রিন্ট. ৭০এ, এস.এন. ব্যানার্জি রোড. কোলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক: মালবী গুপ্ত। যোগাযোগ: সি-এল ২৫৫, সল্টলেক-২, কলকাতা-৭০০০৯১। ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪। ই-মেল: prithibir_diary@rediffmail.com